
কুরআন-সুন্নাহর
স্পর্শ
ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

কুরআন-সুন্নাহর স্পর্শ

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

কুরআন-সুন্নাহর স্পর্শ
ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশনায়: খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

মুদ্রণ: দি কাসওয়া কম্পিউটার
সিটি বানিজ্যিক ভবন
বন্দর বাজার

মূল্য: ১০০.০০ টাকা

অর্পন

আমার শায়খ হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী-
যার দিক নির্দেশনায় নতুন জীবন পেয়েছি।

সূচীপত্র

১। ভূমিকা

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর তারালার জন্য খাছ। কেননা, তিনিই একমাত্র সত্তা যাকে ছাড়া দুনিয়া ও মহাজগত সৃষ্টি হতো না। এমনকি স্থান, কাল, স্থিতি, গতি অর্থাৎ ভৌতবিশ্বের সকল বিজ্ঞান আল্লাহর সৃষ্টি। যদি কেউ বলেন-এটা সত্য নয় তবে আমি বলবো-আপনার হাতে কোন প্রমাণ নেই কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে।

প্রথম প্রমাণঃ

জগতের সর্বত্র এবং মানুষের দেহ কাঠামো ও মন-মস্তিষ্কে-হৃৎপিন্ডে নকশা বা ডিজাইনের উপস্থিতি সকল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন। এখন যদি ডিজাইন থাকে-তবে তার জন্য কারণ হিসেবে একজন ডিজাইনারও থাকতে হবে। জগতে মানুষ ছাড়া আর কোন সত্তা নেই-কেবল আল্লাহ তায়ালা ছাড়া- যে কৌশল জানে ও ডিজাইন করতে পারে ও তা বাস্তবায়ন বা মেটেরিয়ালাইয করতে পারে। কিন্তু সকলেই জানে- মানুষ জগতের ডিজাইনার নয়তো বটেই- এমন কি নিজের দেহ কাঠামোর ডিজাইনও মানুষ নিজে নিজে করতে পারেনি। বাকী রইলেন-একমাত্র আল্লাহ। তিনিই একমাত্র ডিজাইনার জগত ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল ভৌত ও জীবজগতের। ইমাম গাজ্জালী অভ্যন্ত শক্তিশালী প্রমাণ দিয়েছেন আল্লাহর অস্তিত্বের ও জগতের সৃষ্টির কারণের। সেটিই আমার দ্বিতীয় প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণঃ

ইমাম গাজ্জালীর প্রমাণটি কালাম কসমোলজিক্যাল আরগুমেন্ট নামে মশহুর। তিনি জগতের অস্তিত্বের পেছনে যে একমাত্র একজন সত্তাই আছেন তার প্রমাণ পেশ করেন তিন ধাপের যুক্তি দিয়ে।

১ম যুক্তিঃ যে বা যার প্রারম্ভ আছে, তার পেছনে কারণের অস্তিত্ব আছে।

২য় যুক্তিঃ মহাজগতের প্রারম্ভ আছে।

৩য় যুক্তিঃ সুতরাং মহাজগতের অস্তিত্বে আসার পেছনে কারণ থাকবেই।

সেই কারণ হলেন আল্লাহ তায়ালা। এভাবে মহামহিম আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ হয়ে গেল। আর জগতের ডিজাইনও সাক্ষ্য দেয় এই প্রমাণের। আমার নিজস্ব প্রমাণটি এবার পেশ করছি।

তৃতীয় প্রমাণঃ

১ম যুক্তিঃ কোথাও কোন ডিজাইন দেখা গেলে তার পেছনে ডিজাইনার থাকবে।

২য় যুক্তিঃ জগতের সর্বত্র ও মানুষের মাঝে, জীব-উদ্দিভদের মাঝে, ডিজাইন আছে।

৩য় যুক্তিঃ সুতরাং জগতের একজন ডিজাইনার, যিনি সকল কিছুর একমাত্র ডিজাইনার, আছেন।

সেই ডিজাইনার আল্লাহ তায়ালা। এভাবে বিশ্বপ্রভু আল্লাহর অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হলো।

চতুর্থ প্রমাণঃ এটি সাধারণ মানুষের উপযোগী প্রমাণ।
১ম যুক্তিঃ কোথাও ধোয়া দেখা গেলে-সেখানে অগ্নির উপস্থিতি প্রয়োজন।

২য় যুক্তিঃ জগতের সর্বত্র রেডিয়েশন বা বিকিরণ, যা ধোয়ার সমার্থক, প্রচুর পরিমাণ দৃশ্যমান।

৩য় যুক্তিঃ ঐ বিকিরণের পেছনের কারণ যে অগ্নি-তার স্রষ্টা আল্লাহ।

প্রঞ্চম প্রমাণঃ এটি একটি দার্শনিক প্রমাণ।
১ম যুক্তিঃ জগতটা যেমন এমন না হলে মানুষের অস্তিত্বে আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

২য় যুক্তিঃ মানুষের অস্তিত্বের জন্যই জগতের সৃষ্টির পেছনে একজন কর্তা বা স্রষ্টা প্রয়োজন।
৩য় যুক্তি: সেই স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা।

ষষ্ঠ প্রমাণঃ এই প্রমাণটি বিশ্বাসীদের কাছে অতি গ্রহণীয় হিসেবে আছে।

১ম যুক্তিঃ পৃথিবীতে মানুষের পত্তনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাসূল এসে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহয় বিশ্বাস কর।

২য় যুক্তিঃ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নবী রাসূলদেরে সত্যবাদী হিসেবে পেয়েছে।

৩য় যুক্তিঃ সুতরাং নবীরাসূলদের প্রচারিত একক ঈশ্বরের ধারণা সত্য।

সপ্তম প্রমাণঃ এটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত প্রমাণ।
১ম যুক্তিঃ মানব সমাজে অতীতের সকল নবীই অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন এবং তাঁরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও এককত্ব প্রচার করেছেন।

২য় যুক্তিঃ সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মোহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনকালে সবচেয়ে সত্যবাদী ছিলেন এবং তিনিও আল্লাহর প্রভুত্ব প্রচার করেছেন।

৩য় যুক্তিঃ সুতরাং মোহাম্মদ (সাঃ) এর কথা সত্য এবং আল্লাহ জগতের একক ও একমাত্র স্রষ্টা ও প্রভু।

অষ্টম প্রমাণঃ এটি একটি অসাধারণ প্রমাণ।
১ম যুক্তিঃ পৃথিবীর সকল গ্রন্থে কিছু না কিছু ভুল থাকেই এবং সেই ভুলের কারণ মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।

২য় যুক্তিঃ আল কুরআনে আজ পর্যন্ত কোন ভুল কেউ বের করতে পারেনি।

৩য় যুক্তিঃ সুতরাং আল কুরআন ঐশী কিতাব যা জগতের সবচেয়ে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত।

৪র্থ যুক্তিঃ আল কুরআনের সুরা ত্ব হা-তে বলা হয়েছে, আল্লাহ সকল কিছুর ভৌত কাঠামোর নির্মাতা ও সকল ভৌত ও জৈব জীবের দিশা দানকারী।

পঞ্চম যুক্তিঃ সুতরাং ভৌতবিশ্বের নিয়ন্ত্রণে যে বিজ্ঞান কাজ করে-তার স্রষ্টা আল্লাহ।

নবম প্রমাণঃ
বার্টান্ড রাসেল, নোবেলজয়ী দার্শনিক, বলেছেন সবকিছুর পেছনে কারণ থাকে যদি তবে স্রষ্টার অস্তিত্বে আসার পেছনেও কারণ থাকতে হবে। কিন্তু তা আমরা পাচ্ছি না। সুতরাং স্রষ্টা নেই। বার্টান্ড রাসেলের এ কথা অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ-

১ম যুক্তিঃ যার প্রারম্ভ নেই তার পেছনে কারণই নেই।

২য় যুক্তিঃ আল্লাহর কোন প্রারম্ভ নেই, তিনি অনাদি।

৩য় যুক্তিঃ সুতরাং আল্লাহ অস্তিত্বে এসেছেন কোন কারণ ব্যতিরেকেই।

পাঠক, এই নয়টি প্রমাণের যে কোন একটি যদি আপনি খন্ডাতে পারেন, তবে আপনার নাস্তিক হবার জন্য আমার কোন আফসোস থাকবে না। কিন্তু আমি জানি আপনি ঐ প্রমাণগুলোর একটিকেও ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারবেন না। সুতরাং আমার উপদেশ আর কাল বিলম্ব না করে, এখনই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যান। আর আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত হোন। তবেই যুক্তি মিলবে আল্লাহর প্রতিশ্রুত আযাব-গযব থেকে। আপনার জন্য আমার শুভ কামনা রইল।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমি শেষ নবী ও রাসূল মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট প্রেরিত ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন ও নবীজী (সাঃ) এর পবিত্র হাদিসের মধ্যে যে অভূতপূর্ব প্রজ্ঞা দেখা যায়- তার কিঞ্চিত বর্ণনা সন্নিবেশিত করবো ইনশাল্লাহ। গ্রন্থ পাঠের আমন্ত্রণ রইলো।

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
জুন, ২০২৫।

২। প্রজ্ঞাময় কুরআন

আল কুরআন অসৃষ্ট। আল্লাহ যেমন সৃষ্ট নন, তেমন তার ওহীও সৃষ্ট নয়। তদুপরি, আল্লাহর প্রতিটি কথা প্রজ্ঞার আকর। আল্লাহ নিজেই সে ঘোষণা দিয়েছেন। সূরা ইয়াসীনের প্রথম দুই আয়াত পেশ করছি। "ইয়া-সীন। শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের।" (কুরআনঃ ৩৬ঃ ১-২)।

'ইয়া-সীন' অক্ষর দুটি নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। অনেক তাফসিরবিদ বলেছেন-এটির অর্থ "হে মানুষ।" হতে পারে তা। কিন্তু যেহেতু আল কুরআন মহানবী মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট প্রেরিত, সুতরাং হে মানুষ বলতে এখানে মোহাম্মদ (সাঃ) কেই বুঝানো হয়েছে। এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ভারতের দিল্লীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ এর পুত্র শাহ রফিউদ্দীন কৃত তরজমায়। তিনি ইয়া-সীন অক্ষর দুটির তরজমায় লিখেন- "ইয়া, সাইয়েদ।" অর্থাৎ 'হে সর্দার'। আর কে না জানে যে- হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম মানুষ ও মানবকুলের নেতা বা সর্দার। এ প্রসঙ্গের পরই আল্লাহ বলেন, "শপথ প্রজ্ঞাময় কুরআনের"। অর্থাৎ আল কুরআন এক প্রজ্ঞাগ্রন্থ। এখানেই পাওয়া যাবে-মানুষের প্রয়োজনীয় সকল প্রশ্নের সমাধান। এখানেই পাওয়া যাবে জীবন যাপনের সঠিক তরীকা। 'হাকীম' শব্দটি এসেছে 'হিকমাহ' শব্দ থেকে। আর 'হিকমাহ' যথার্থ অর্থেই 'প্রজ্ঞার' আরবী সংস্করণ। সুতরাং আল-কুরআন প্রজ্ঞার আকর। প্রজ্ঞার দ্বিতীয় আকর হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীস যাকে বড় পরিসরে বলা হয় সুন্নাহ। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন যাপনের তরীকা, তাঁর কথা,

তাঁর কাজ, তাঁর অনুমোদিত কাজ সকল কিছু এক কথায় সুন্নাহ। আল্লাহ তায়ালা সূরা জুমআ'য় বলেছেন যে, "তিনি (অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ)-কে) প্রেরণ করেছেন মানুষকে ঐশী কিতাব শিক্ষা দেয়া ও 'হিকমাহ' শিক্ষা দেয়ার জন্য।" সূরা জুমআ'র ঐ আয়াতের তরজমা পেশ করছি।

"তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ) সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুল আবির্ভূত করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও প্রজ্ঞা (বুদ্ধিমত্তা)। ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট ভুলে।" (কুরআনঃ ৬২ঃ২)।

২.১ । *জীবন-মৃত্যুর হেতু*

মানুষতো বটেই, সকল জীবজন্তু, এমনকি বৃক্ষলতা-উদ্‌ভিদ, অস্তিত্বে আসে অর্থাৎ জন্ম নেয়। অতঃপর নির্দিষ্ট (আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দিষ্ট) সময় পর মৃত্যুবরণ করে এ ধরাধাম ত্যাগ করে। এই যে জীবন-মৃত্যুর ধারাবাহিকতা আদিকাল থেকে চলছে-এর হেতু কী? এর একটি যুতসই জবাব আমরা চাই। তবে কোন মানুষ তা দিতে অক্ষম। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এর সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম।" (কুরআন, ৬৭:২)।

আমরা যেমন স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় পড়াশোনা করি ও প্রতিটি কোর্স শেষ হবার পর পরীক্ষা নেয়া হয়। পরীক্ষায় যে ভালো ফলাফল লাভ করে, সে উন্নত জীবনের আশা করতে পারে। অর্থাৎ পরীক্ষা কেবল

পরীক্ষার নিমিত্তে নয়-বরং পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করলে-ছাত্রজীবন শেষে ভালো মাইনের ভালো চাকুরী পাওয়া যায় ও সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যায়। এখানে পরীক্ষাটা চলে কেবল ছাত্রজীবনে আর উত্তম বিনিময় পাওয়া যায় কর্মজীবনে। অর্থাৎ এখানে দুটি অংশ রয়েছে। ছাত্রজীবন অতঃপর কর্মজীবন। আল্লাহতায়ালাও মানুষকে দুটি অংশের সংবাদ দিচ্ছেন। প্রথমটি দুনিয়ার জীবন। এখানে আল্লাহ পরীক্ষার পর পরীক্ষা নিতে থাকেন। আর দেখেন- কে কর্ম করে ভালোভাবে বা উত্তম পদ্ধতিতে। যে কর্মে উত্তম- সে এর বিনিময় পাবে আখেরাতে। আখেরাতে রয়েছে উত্তম কর্মের বিনিময়ে জান্নাত আর অধমের জন্য রয়েছে শাস্তির স্থান দোযখ।

এখন প্রশ্ন হলো- আখেরাতের প্রয়োজনীয়তা কি? সবকিছু দুনিয়াতেই শেষ করা যেতো। কিন্তু না- আল্লাহ যেমন- মানুষ-জীবজন্তুর মৃত্যু দেন- তেমনি দুনিয়ারও পরিসমাপ্তি তিনি ঘটাবেন। কেয়ামত সংঘটিত হবে। অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ দ্বিতীয় সৃষ্টি করবেন। সেটিতে থাকবে- জান্নাত বা বেহেশত এবং দোযখ বা অগ্নির শাস্তিস্থান। প্রশ্ন হলো- আখেরাতের প্রবেশদ্বার কোনটি? আল্লাহ বলেন- আখেরাতের প্রবেশদ্বার হলো- মৃত্যু। মৃত্যু দ্বারা জীবনকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। জীবনকাল দুনিয়াতে স্বল্পসময়ের ও এটি পরীক্ষার হল। পরীক্ষার পর দ্বিতীয় জীবন সেটি অনন্তকালব্যাপী বর্তমান থাকবে। সেই জীবনে সুখে থাকবে কেবল তারাই যারা দুনিয়ার জীবনে উত্তম কর্ম সম্পাদন করেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো- আমরা ছাত্র থাকাকালে বই পড়ে শিখি ও তাঁর উপর পরীক্ষা দেই। তো আল্লাহ আমাদের কীভাবে পরীক্ষা করবেন। আল্লাহর

পরীক্ষাও বই নির্ভর। সেই বই দুটি হলো- কুরআন-হাদীস। কুরআন ও হাদীসে যে সমস্ত উত্তম কর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে- সেগুলো সম্পাদন করা হয় কিনা এটাই আল্লাহর পরীক্ষা। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে যে সমস্ত কর্ম উত্তম সেগুলো মানুষ ঠিকমতো করে কিনা তাই আল্লাহ দেখতে চান। অতঃপর মৃত্যু সকল কর্মের তথা পরীক্ষার সমাপ্তি টেনে দেয়। শুরু হয় কর্মের বিনিময়ের পালা। কবর থেকেই এই বিনিময়ের ধারা চালু হয়ে যায়। কবরে মানুষ শান্তিতে থাকবে যদি দুনিয়ার জীবনকালে উত্তম কর্ম করে থাকে। অতঃপর দ্বিতীয় জীবনের বেলায়, যেটি শুরু হবে বিচার দিবসে, উত্তম কর্মের কর্মীরা জান্নাতে সৌন্দর্য ও বরকতময় অনন্ত জীবন পাবে। মন্দকর্মের কর্মীরা শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং সেটি হবে দোযখে। আল্লাহ তাই বলেছেন- জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য - অর্থাৎ তিনি দেখতে চান কে কর্মে উত্তম। উত্তম কর্মের মধ্যে রয়েছে সবর ও শোকর, আল্লাহ নির্ভরতা, দুনিয়া বিমুখতা, কৃচ্ছ্রতা, ইবাদাতে ইস্তেকামাত, কষ্টে উদ্বেলিত না হওয়া। মন্দ এর বিপরীত বিষয়গুলি। যেমন, না শোকরি, অধৈর্য, আসবাব নির্ভরতা, দুনিয়ার ভালোবাসা, বিলাসী জীবন, ইবাদাত বন্দেগীতে শিথিলতা, কষ্টে পড়ে হাহুতাশ।

ভালো ও মন্দের উভয়টির দুই দিক আছে। অর্থাৎ প্রকৃত ভালো ও আপাতদুষ্টিতে ভালো। অন্যদিকে, প্রকৃত মন্দ ও আপাতদৃষ্টিতে মন্দ। আল্লাহতায়ালা মানুষকে পরীক্ষা করেন উভয়টি দিয়েই। আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (কুরআন, ২১ঃ৩৫)।

আমরা সাধারণত সেটিই আগে বলি যা প্রধান ও সচরাচর ঘটে। আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে প্রথমে মন্দের কথা বলেছেন। সুতরাং মানুষকে আল্লাহ সর্বাধিক পরীক্ষা করেন মন্দ দিয়ে। আগেই বলেছি মন্দের দুটি দিক আছে। আপাত মন্দ ও প্রকৃত মন্দ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকৃত মন্দ মানুষের জীবনে আসে শাস্তিস্বরূপ। পরীক্ষা হয় আপাত মন্দ বিষয় দিয়ে। তেমনি ভালোরও দুটি দিক তথা আপাত ও প্রকৃত। আপাত ভালোটি শাস্তির উপকরণ। প্রকৃত ভালোটি পরীক্ষার বিষয়। মানুষ যখন ভালো অবস্থায় পড়ে সে যদি তখনও আল্লাহকে না ভুলে এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করে, সেটি একটি উত্তম পরীক্ষা বটে। এই পরীক্ষা পাশ করাও সহজ। এখন পরীক্ষায় আল্লাহ সকলকে ফেলেন না। যারা এখন পরীক্ষায় পড়ে- তারা যদি বলে "আল হামদুলিল্লাহি আল কুল্লি হাল।" অর্থাৎ সর্ববিস্থায় একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা। তখন সে সঠিক পথে আছে বলে ধরে নেয়া যায়।

এ পরিচ্ছেদের শেষ কথাটি এটিই। জীবনে ভালো মন্দ থাকবেই। এগুলোকে যাচাই করতে হবে এমনভাবে যে- এটি কি শাস্তি না পরীক্ষা। যদি পরীক্ষা হয় তবে অবলম্বন করতে হবে উত্তম পথ। অর্থাৎ তখন সবর-শোকর, তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। মন্দের বেলায়ও তাই। দেখতে হবে এই মন্দটি প্রকৃত মন্দ কি না। যদি বুঝা যায়-এটি প্রকৃতই মন্দ তবে ধরে নিতে হবে-এইটা আল্লাহর শাস্তি। তখন বেশী বেশী এস্তেগফার ও ইবাদাত বন্দেগী করতে হবে। জীবন যেমন ভালো -মৃত্যুও তেমনই ভালো-যদি জীবনটা উত্তম কর্মের মধ্যে থেকে অতিবাহিত করা যায়।

২.২ / আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহ বলেন, “সে (ফেরাউন) বললঃ তবে হে মুসা, তোমাদের পালনকর্তা কে? মুসা বললেনঃ “আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।” (কুরআন, ২০ ঃ৪৯-৫০)।

এই আয়াতে কারীমাকে আমি দেখি এমনভাবে যে, এটি সৃষ্টি জগতের প্রত্যেকের জন্য একটি করে অনুগ্রহ। ভৌত বিশ্ব ও এর উপাদান সমূহের প্রত্যেকটির আকৃতি আছে। কিন্তু সেই আকৃতিটি যেমন তেমন নয়- অর্থাৎ আল্লাহ বেখায়ালে কোন কিছুকে এমন, কোন কোন কিছুকে তেমন আকৃতি দিয়ে-দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। না বরং আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর কাজ নির্ধারণ করেন এবং সেই কাজ আঞ্জাম দেবার জন্য যেমন আকৃতি প্রয়োজন তেমন আকৃতিই দিয়েছেন। সৃষ্টির মধ্যে বিশেষতঃ প্রাণীজগতে প্রাণীদের মধ্যে ভালোমন্দ উভয়টিই বিদ্যমান। যেমন, বানর। বানরকে আল্লাহ লম্বা লম্বা লাফ দেয়ার যোগ্যতা দিয়েছেন। এভাবেই সে চলে ফিরে। এই লাফ দেয়ার যোগ্যতা যেমন আকৃতিতে আসে, তেমন আকার আকৃতিই বানরকে আল্লাহ দিয়েছেন।

সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। মানুষের গন্তব্যও অনেক উঁচু ও নীচু। কিন্তু আল্লাহ চান না যে-মানুষ নীচু গন্তব্যে যাক। মানুষকে উচ্চস্থান ও উত্তম স্থান জান্নাতে যাবার যোগ্যতা দিয়েছেন। সেজন্যে আল্লাহ মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ আকার-আকৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, “শপথ ডুমুর ও যয়তুনের, এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের, এবং এই নিরাপদ নগরীর । আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে। অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে।”

(কুরআন, ৯৫ঃ১-৫)।

আল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম। কারণ- আল্লাহ মানুষকে অতি উচ্চতম স্থান জান্নাতে যাবার জন্যে উত্তম ও সুন্দর সুন্দর কর্ম করার উপযোগী করে গড়েছেন। পরের আয়াতটি সকলের জন্য নয়। যারা মন্দ কর্মে ডুবে থাকে তাদেরকেই আল্লাহ ধমকী দিয়েছেন এই বলে যে- তাদেরকে নীচ থেকে নীচে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐসব মন্দ লোকেরা মন্দেই মজা পায় আর একেকটি মন্দ তাকে তার নির্ধারিত উচ্চস্থান থেকে নীচুতে নিয়ে যায়। এভাবে মন্দের পর মন্দ যারা করতে থাকে তারা ধীরে ধীরে আরো নীচে চলে যায় এবং আখেরাতে দোযখে স্থান পাবার উপযুক্ত হয়ে যায়।

তবে আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তিনি মানুষকে সুন্দরতম আকার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যেন সে নিজের উত্তম গঠনের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে ও উত্তম কর্ম করে।

জান্নাতে যাবার উপযুক্ত হয়। তাই আল্লাহ উপরোক্ত সূরা তোহার আয়াতে বলেছেন- তিনি প্রত্যেককে পথের দিশা দিয়েছেন।

ভৌত বিশ্বের বড় থেকে বড়, ছাট থেকে ছোট সকল বস্তুকে তিনি দিশা দিয়েছেন বিজ্ঞানের মাধ্যমে। মানুষকেও আল্লাহ বিজ্ঞানী বানিয়েছেন এবং সে সাথে জান্নাতে যাবার উপযোগী কাজ করার জন্য হেদায়াত স্বরূপ নবী-রাসূলদের মাধ্যমে ঐশী কিতাব ও নবী -রাসূলদের উত্তম কর্মের বিবৃতি মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

আমাদের জন্য তাই রয়েছে কুরআন ও হাদীস। এই দুই কিতাবসমূহে আল্লাহ মানুষকে দুটি পথই দেখিয়েছেন। অর্থাৎ উচ্চস্থান লাভের তরীকা আর নীচুস্থানে তথা দোযখে যাবার রাস্তা। এজন্যেই আল্লাহ বলেন, "বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। অতঃপর সে ধর্মের ঘাটিতে প্রবেশ করেনি।" (কুরআন, ৯০:১০-১১)।

এই সূরাতেই শেষ দিকে আছে, "আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা।" (কুরআন, ৯০:১৯)।

এই হলো-উচ্চস্থান লাভের একটি পথ তথা ধর্মের ঘাঁটি, আর নীচুস্থানে পতিত হবার অন্যপথ তথা আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করে কাফের হিসেবে মৃত্যুবরণ।

তবে আল্লাহর অনুগ্রহ যে-তিনি শুধু জান্নাতে যাবার পথ দেখান নি, বরং দোযখে যাবার পথও পরিস্কার করে বর্ণনা করেছেন। আমাদের উচিত হবে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করা। সেটি কীভাবে? আল্লাহ বলেন, "আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? তা হচ্ছে দাস মুক্তি আর দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান এতিম আত্মীয়কে অথবা ধুলি-ধুসরিত মিসকিনকে অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। তারাই সৌভাগ্যবান।"
(কুরআন, ৯০: ১২-১৮)।

আল্লাহর অনুগ্রহ যে-তিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি বানিয়েছেন এবং আমাদের জীবন কীভাবে ভালো হবে আর কীভাবেই না অধঃপতিত হবে-তা তিনি আল কুরআনের মাধ্যমে ও তাঁর শেষ রাসূলের(সাঃ) এর

মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। ভৌতবিশ্বও সৌভাগ্যবান, কারণ-ওদের কোন বিচার-হিসাব-নিকাশ হবে না এবং তারা তাদের ফাংশন করার উপযোগী আকার -আকৃতি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছে এবং তাদের ফাংশনের পদ্ধতি বিজ্ঞানও আল্লাহ দিয়েছেন।

২.৩ / *কতিপয় বৈজ্ঞানিক তথ্য*

২.৩.১। আল্লাহ বলেন, "ইনসাফ অবশ্যম্ভাবী। পথবিশিষ্ট আকাশের কসম, তোমরা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ।" (কুরআন, ৫১:৬৭)। এখানে তিনটি বিষয়। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সকল সুষ্টির মধ্যে ইনসাফ অনুযায়ী ফয়সালা দিবেন। এই ফয়সালা দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। দুনিয়াতে যারা মন্দে লিপ্ত তাদের উপর আল্লাহ ইনসাফ কায়েম করবেন এভাবে যে, তারা ঈমান আনতে সক্ষম হবে না। অতঃপর আখেরাতেও আল্লাহ ইনসাফ কায়েম করবেন তাদের উপর এমনভাবে যে, তিনি নিক্তি দিয়ে মানুষের ভালো কর্ম ও মন্দ কর্মের ওজন নির্ণয় করে জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা দেবেন। যারা দুনিয়াতে সর্বদা উত্তম কর্মে নিয়োজিত আছে, হাশরের মাঠে, মীযানে তাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের ফয়সালা দেবেন। যারা দুনিয়ায় পাপে নিমজ্জিত হাশরের মাঠে মীযানে তাদের বদীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ দোযখে যাওয়ার রায় দেবেন। এভাবে ইনসাফ করা আল্লাহর অন্যতম সিফাত।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে-বিজ্ঞান। আল্লাহর এক নিদর্শন হলো-তিনি মহাজগত কায়েম করেছেন বিজ্ঞান দিয়ে ও বস্তুনিচয়কে পথ দেখাচ্ছেন-বিজ্ঞান দিয়ে। আল-কুরআন আমাদের কাছে এসেছে ১৪৪৬ চান্দ্র বৎসর পূর্বে। আর মাত্র ১০০ সৌরবৎসর পূর্বে বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন উদঘাটন

করলেন যে, বস্তুনিচয় আকাশে বিচরণ করে কোন বলপ্রয়োগের কারণে নয়। বরং আকাশ পথবিশিষ্ট। একটি নক্ষত্র বা গ্রহ তার চারপাশের আকাশকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, মনে হয় ওখানে পথরেখা রয়েছে। বস্তুগুলো নক্ষত্র বা গ্রহের আকর্ষণে নয় বরং আকাশে চিহ্নিত পথ ধরে চলাচল করে। এটি আইনস্টাইনের সাধারণ রিলেটিভিটির সিদ্ধান্ত। আর এটি অভ্যন্ত জটিল ও বিরাট বড় গণিতের ব্যবহারে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাইতো আল্লাহ এই বিষয়টির কসম খেয়েছেন। অর্থাৎ এটি অর্থাৎ পথবিশিষ্ঠ আকাশ অন্যতম এক বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা।

তৃতীয় বিষয়টি হলো, কাফেররা কোন দিনই একমুখী সত্যের অনুযায়ী ছিল না এবং এখনও তারা সে পথে নেই। তাদের কথা বিরোধপূর্ণ। তিনটি সেমেটিক ধর্ম তথা ইসলাম, জুডায়িজম ও ঈসায়ী ধর্ম রয়েছে। এই তিনটির মধ্যে একমাত্র ইসলামীক মানুষই সত্য ও একমুখী সত্যের অনুযায়ী। অন্যরা যা বলে তার মধ্যে সহজেই বিরোধপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হয়। তাই আল্লাহ কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তোমরা বিরোধপূর্ণ কথাবার্তা বল। আল্লাহ মাফ করুন-কখনই যেন-মুসলমানেরা বিরোধপূর্ণ কথাবার্তা ও বিষয়াদিতে জড়িত না হয়।

২.৩.২।

আল্লাহ বলেন, “আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।”

এটি একটি মহা বিস্ময়কর আয়াত সময়ের প্রেক্ষাপটে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা-মদীনায় জীবনযাপন করছিলেন তখন সেখানে বিজ্ঞানের উপর কোন গবেষণা হতো না। আর মহাবিশ্বটা প্রকৃতপক্ষে কেমন তা

জানা ছিল না। তবে এতটুকু সকলেই আল-কুরআনের মাধ্যমে জানতো যে, আকাশ সাতটি। অর্থাৎ সাত স্তরবিশিষ্ট আসমান। তাঁর উপরে আল্লাহর আরশ।

মহাবিশ্ব যে, সম্প্রসারিত, তাও তারা জানতেন না। আজ থেকে মাত্র ৮০/৮৫ বছর পূর্বে বিজ্ঞানী হাবলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, মহাবিশ্বটা সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের বিল্ডিং ব্লক হলো গ্যালক্সিগুলো। হাবল দেখলেন-গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। আর এই দূরে যাবার গতি গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে দূরত্বের সমানুপাতিক। অর্থাৎ দুটি গ্যালাক্সি যদি খুব দূরে অবস্থান করে, তবে তাদের আরো দূরে যাবার গতি বেশী তুলনামূলকভাবে যেসব গ্যালাক্সি কাছাকাছি আছে তাদের চেয়ে। মাত্র ৮০ বছর পূর্বে আবিষ্কৃত এই বৈজ্ঞানিক সত্য আল্লাহ আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে মুসলমানদের কে এবং সাধারণভাবে সকল মানুষকে অবহিত করেছেন। একি আল্লাহর নিদর্শন নয়? এই নিদর্শন এখন মানুষ বিজ্ঞানের কল্যাণে স্বীকার করে কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময় কাফেররাতো আল কুরআনে আস্থা আনেনি। তারা তাই ছিল আল্লাহর নিদর্শন অর্থাৎ আল-কুরআন অস্বীকারকারী।

২.৩.৩।

আল্লাহ বলেন, "তোমর পালনকর্তা মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, গৃহ নির্মাণ করো পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষের গৃহে; অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহরণ করো, অতঃপর তোমরা পালনকর্তার সহজ পথ অনুসরণ করো। তাদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙ্গের পানীয় নির্গত হয়, তাতে মানুষের জন্যে রয়েছে, রোগের

প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।” (কুরআন, ১৬ঃ৬৮-৬৯)

আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্যে মৌমাছি এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এদের রয়েছে এমন মস্তিষ্ক যার সাহায্যে এরা সূর্যের আলোকরশ্মির পোলারাইজড (মেরুকরণ অবস্থা) ফিল্ড অনুসরণ করতে পারে। আলোক সাধারণত আনপোলারাইজড কিছু পরিমাণে। কিন্তু প্রতিফলনের ফলে আনপোলারাইজড রশ্মি কিছুটা বেশী পোলারাইজড হয়। পৃথিবীর উপরি তলে প্রতিটি স্থানে আলোকরশ্মির একটি ফিল্ড, যার রয়েছে প্যাটার্ণ, তৈরী হয়। এই ফিল্ড প্যাটার্ণের মধ্যে থাকে একটি বিশেষ দিক। ঐ দিক চিনে নেবার ক্ষমতা রয়েছে মোমাছির। মৌমাছি পথ চিনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, সূর্যালোকের ইলেকট্রিক ফিল্ড অনুসরণ করে। মৌমাছি ছাড়া অন্য প্রাণী বা পতঙ্গের এই গুণ নেই। এই ফিল্ড অনুসরণ করে চলাচল করার ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা।

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহর দেয়া সহজ পথ অনুসরণ করার প্রসঙ্গটি আসছে কেন? এসেছে এজন্যে যে, মৌমাছির পথ অনুসরণ করার বিশেষ' ব্যবস্থা যা উপরে আলোচিত হয়েছে, তা আছে। মৌমাছির এই বিশেষ গুণের ব্যবস্থা আল্লাহই করেছেন। আর তিনি তা করেছেন বলেই তাঁর কালামে এই প্রসঙ্গটি এনেছেন।

এই যে বিশেষ ক্ষমতা, যা কিনা বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা, মৌমাছির-তা পূর্বে জানা ছিল না, মাত্র শতাব্দিকাল পূর্ব থেকে এই গবেষণা চলছে মৌমাছিদের ও অন্যান্য পতঙ্গের স্বভাব ও ক্ষমতা বিষয়ে তথ্য। আর

জানা গেছে বিস্ময়কর তথ্য। এতে প্রমাণ হয়ে যায় যে, আল-কুরআন সত্য এবং অলৌকিক।

২.৩.৪।

আল্লাহ বলেন, "হে জিন ও মানব সম্পদায়! যদি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সীমারেখা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের থাকে তবে (যাও! অতঃপর) তা অতিক্রম করেই দেখো। (কিন্তু আমার দেয়া বিশেষ) ক্ষমতা ছাড়া তোমরা কিছুতেই (এ সীমা) অতিক্রম করতে পারবে না।" (কুরআন, ৫৫ঃ৩৩)।

আজও সুদূরপ্রসারী অর্থবহ এ পবিত্র আয়াত। বর্তমানকালের আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দ্বিধাদ্বন্দে আছেন এই কথায় যে-মহাবিশ্বটা কী অসীম না সসীম? যেহেতু মহাবিশ্ব ক্রমবর্ধমানহারে সম্প্রসারিত হচ্ছে তাতে মনে হয় মহাবিশ্বটা অসীমকে ছুঁয়ে ফেলবে। অর্থাৎ মহাবিশ্বটা হয়ে যাবে অসীম। কিন্তু আইনস্টাইন প্রথমদিকে সসীম মহাবিশ্বের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীতে তার অবস্থান তিনি পাল্টান।

কিন্তু উপর্যুক্ত আয়াত-দৃষ্টে এটা সুস্পষ্ট যে, মহাবিশ্বের একটা সীমা আছে। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে হতে এক সময় সেই সীমায় পৌঁছে থেমে যাবে এবং তারকারাজিও সেখানে গিয়ে অস্তগমিত হবে। তাদের উজ্জ্বলতা শেষ হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় সূরা ওয়াক্বিয়া থেকে। আল্লাহ বলেন, "অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি। নিশ্চয় এটা এক মহা শপথ-যদি তোমরা জানতে।" (কুরআন, ৫৬ঃ৭৫-৭৬)।

আল্লাহ তারকারাজির অস্তাচলের শপথ নিয়েছেন এবং বলেছেন, এ এক মহাশপথ। সুতরাং এ কোন মামুলি বিষয় নয়। নচেত আমরা প্রতি দিনই তারকা অস্তগমন বা অনুপস্থিতি টের পাই দিবসে। রজনীতে আবার তারকাদের দেখা যায়। এটি মামুলি না হলেও আল্লাহর মহাশপথের জন্য এটি যর্থাথ বিষয় নয়। বরং আল্লাহর শপথ- মহাবিশ্বের প্রান্ত সীমায় পেৌঁছে সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে বা অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। মোটকথা, মহাবিশ্বের একটি সীমানা বা Boundary আছে- যদিও কিনা মহাবিশ্বটা ক্রমবর্ধমান হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বটা সসীম। ইসলামের সামগ্রিক বিশ্লেষণ একত্র করলে কোন বিজ্ঞানী-স্বীকার না করে পারবেন না যে, মহাবিশ্বটা সসীম।

উপর্যুক্ত আয়াতের শেষ কথাটি হলো- “ইল্লা বিসুলতান”। সাধারণভাবে এর অর্থ দাড়ায়- “ক্ষমতা ছাড়া।” অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া বিশেষ ক্ষমতা ছাড়া মহাবিশ্বের সীমা জিন-ইনসান কেউই অতিক্রম করতে পারবে না। “ইল্লা বি সুলতান” শব্দগুচ্ছ দিয়ে বুঝা যায়- আল্লাহ কাউকে এ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তাফসিরবিদ হযরত সৈয়দ হোসাইন আহমদ বলেছেন- এই “ইল্লা বি সুলতান” এর এক অর্থ হলো-আল্লাহ একজনকে হলেও এ ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং আমরা জানি তিনি হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মেরাজ রজনীতে তিনি সপ্তাকাশ অতিক্রম করেছিলেন জিব্রাইলের সহযোগিতায় এবং আল্লাহর আরশের নিকটবর্তী হয়েছিলেন। আর আমরা জানি আল্লাহর আরশ মহাবিশ্বের বাইরে। সুতরাং ‘সুলতান’ বলতে এই আয়াতে রাসূলে করীম (সাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া অন্য কেউ, কোন নবীও নয়- যারা সপ্তাকাশের উপরে আরোহণ করেছেন অর্থাৎ মহাবিশ্বের সীমা অতিক্রম করেছেন।
আল্লাহই সব ভালো জানেন।

৩। মানুষের প্রকৃত সম্পদ

মানুষ জন্ম নেয়, অতঃপর ধীরে ধীরে বড় হয়ে কাজে কর্মে লাগে। সে পার্থিব সম্পদ কম-বেশী কিছু না কিছু লাভ করেই। সংসার পাতার সুযোগ হলে-স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জনক-জননীর আসন লাভ করে। সম্পদ যখন অনেক হয় সে উৎফুল্ল হয়ে যায়। পুত্র-কন্যারা ভালো অবস্থানে গেলে তাদের নিয়ে তারা গর্ব করে। এভাবে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষের গৌরবের ও সুখের কারণ হয়। কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি-এগুলো খুবই অস্থায়ী। কারণ, মানুষ ৭০/৮০ বছরেই পরলোক গমন করে আখেরাতের পথিক হয়ে যায়। তখন কি আর সম্পদ ও সন্তানের সাফল্য কোন কাজে আসে? না। সেখানে মানুষ অত্যন্ত একা হয়ে যায়। আল্লাহর প্রতাপ তাকে শাস্তির সম্মুখীন করতে পারে কিংবা আল্লাহর দয়া তাকে শান্তি দিতে পারে। সুতরাং অনন্ত আখেরাতে সন্তান-সন্ততি বা সম্পদ কোন কাজে আসবে না। আর পৃথিবীতে বসে এসব নিয়ে আশায় উদ্বেলিত হওয়া বাতুলতা। এই বিষটি নিয়ে আল্লাহ তার কিতাবে বহুভাবে বলেছেন। আমি মাত্র একটি আয়াত তুলে ধরবো। আল্লাহ বলেন, “ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম।” (১৮ঃ৪৬)।

স্থায়ী সৎকর্ম কী? সেগুলো হলো আল-কুরআন ও নবীজীর (সাঃ) থেকে পাওয়া সৎকর্ম। আর সে সৎকর্মের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ইবাদাত। যেমন, দৈনিক পাঁচওয়াক্ত সালাত, অতিরিক্ত হিসেবে অত্যন্ত ফযিলতের নামায তাহাজ্জুদ; সিয়াম, যাকাত প্রদান ও হজ্ব-উমরা। এগুলো কোনটি যেমন-সালাত ও সিয়াম অবধারিত সঠিক সময়ে কোন গাফলতি ছাড়াই

পালন করতে হবে। এগুলো হবে-তখন স্থায়ী সৎকর্ম যদি যিকির-আযকারের অভ্যাস গড়ে নেয়া হয়- তবে তাও নির্দিষ্ট সময়ে বিরতিহীন পালন করাও স্থায়ী সৎকর্ম।

হাদীসে রাসূল থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোনদিন অতিরিক্ত কয়েক রাকাত নফল নামায পড়ে ফেলতেন, তবে আর তিনি এই নামায ছাড়তেন না। ঐ সময়ে প্রতিদিন তিনি ঐ নামায আদায় করতেন। এভাবে নবীজীর (সাঃ) সুন্নাহ থেকে আমরা পাই কীভাবে সৎকর্ম স্থায়ী করা যায়। মান-সম্মান, সন্তান-সন্ততি অবশ্যই-কাম্য কিন্তু আখেরাতের অনন্ত জীবনে ভালো কিছু আশা করার জন্য এগুলো স্থায়ী সৎকর্মের চেয়ে অগ্রগামী নয়। স্থায়ী সৎকর্মই আমাদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাবার যোগ্য করে আর স্থায়ী সৎকর্মই আবশ্যক। অর্থাৎ নিয়মিত যে সৎকাজগুলো করা হয় তাই মানুষের প্রকৃত সম্পদ। এ সম্পদ দিয়েই জান্নাতের বিনিময় দেয়া সম্ভব।

৪। ভাগ্যবান কারা

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহুল্য ও স্বল্পতা আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র ও প্রত্যাখাত হওয়ার আলামত নয়। আল্লাহ তায়ালা যখন কাউকে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন সে দুটি ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হয়- (এক) সে মনে করে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণ-গরিমা ও কর্ম-প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্য পাত্র। (দুই) আমি আল্লাহর কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নেয়ামত দান করতেন না। এমনভাবে কেউ দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ সম্মানের পাত্র ছিল, কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্চিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফের ও মুশরেকদের মধ্যে এ ধারণা বিদ্যমান, এমনকি আজকাল মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। এই সকল মানুষ অভাগা। এরা ভাগ্যবান নয়; ভাগ্যবানদের সম্পর্কে ইসলামের বাণী সুসম্পষ্ট। আল্লাহ কুরআনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন।

আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। তারা পথ প্রদর্শিত হয়েছিল সৎকাজের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহর পথপানে।” (কুরআন, ২২ঃ২৩-২৪)।

সুতরাং ভাগ্যবান এরাই যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর নবীদের প্রতি। অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করে-আল্লাহর উপর। আর সৎকর্মের ফিরিস্তিও পূর্ববর্তী এক অনুচ্ছেদে আমি বলেছি। এখানে পুনরাবৃত্তি না করে, ভাগ্যবানদের চিহ্ন যা আল্লাহ উপর্যুক্ত আয়াতে বর্ণনা করেছেন- তা বলছি।

ভাগ্যবানদের আল্লাহ পথ দেখান, সৎকথা বলার তাওফিক দেন। মানুষের কথাই মানুষটি কেমন তার প্রমাণ বহন করে। যারা কটুবাক্য বলে, খিস্তি-খেউর করে, তাদেরকে সমাজের লোকেরা ভালো মনে করে না এবং এড়িয়ে চলে। কটুবাক্যধারী ব্যক্তিরা হতভাগা। যারা সৎবাক্য বলায় আগ্রহী হয়- সে আগ্রহটা আসে আল্লাহর নিকট থেকে। তাই আল্লাহ বলছেন, "তারা পথ প্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে।"

সুতরাং বুঝা গেল- সৎকাজ এক হেদায়েত যা আসে আল্লাহর নিকট থেকে। দ্বিতীয়ত "(তারা) পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহর পথপানে।" এই অংশটুকু অত্যন্ত সত্য ও মূল্যবান। আল্লাহর পথ পানে পরিচালিত হওয়া মানে হলো- সৎকর্মের ইচ্ছা ও রিয়েলাইজেশন এর আকাঙ্খা আসে আল্লাহরই নিকট থেকে।
সুতরাং তারা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়। একে তাসাউফের ভাষায় বলা হয়- সুলুক। আর যারা সুলুকে চলে তারা সালেক। সালেক সেই যে আল্লাহর দিকে যাবার জন্য চেষ্টা মেহনত করে। তার সেই প্রচেষ্টা হয় নিখুঁতভাবে যখন সে কোন মুর্শিদের, যিনি আল্লাহর পথপ্রাপ্ত, অনুসরণ করে তাঁর হাতে হাত ধরে শপথ পাঠের মাধ্যমে। যখন যিকির আযকারে লিপ্ত হয় মুর্শিদের বলে দেয়া যিকির দিয়ে। যখন সে পরোপকার করে। যখন সে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে এবং নিজেকে সর্বদা আল্লাহর

বন্দেগীতে নিয়োজিত রাখে। আল্লাহর ক্ষমা পেতে হলে মানুষকে নিরন্তর চেষ্টা তদবির করতেই হবে। তবেই পৌছা যাবে আল্লাহর নিকট। আল্লাহ বলেন, “হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে অবিরাম কষ্ট করতে হবে, অতঃপর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটবে। (কুরআন, ৮৪:৬)।

মহাজনেরা বলেছেন, এই আয়াতের আলোকে যে, তারাই সফলকাম যারা সারাক্ষণ আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে লেগে থাকে। কখনো সালাতে লেগে যায়, কোনদিন রোজা রাখে, প্রতিদান এক দু বার তিনবার বেশ খানিকটা কুরআন তেলাওয়াত করে। কখনো যিকিরে, কখনো মোরাকাবায় লেগে যায়। কখনো প্রয়োজনে মানুষকে সৎ উপদেশ দেয় বা সত্য পথের দিকে আহবান করে। কষ্টের মাঝেও অভিযোগ থাকে না তার মুখে। সুখেও উদ্বেলিত হয় না।
আল্লাহ একথাও বলে দিয়েছেন, “পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।” (কুরআন ৫৭ঃ২২-২৩)।
সুতরাং সুখে-দুখে সর্বদা অবিচলতা দেখাতে হবে। দুঃখে পড়ে নীচুমনা ডিপ্রেশনে যাওয়া যাবে না। সুখে পড়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে সমাজে অহংকার প্রদর্শন করা যাবে না।

এরূপ যারা করতে পারে এবং এরূপ করার জন্য আল্লাহ যাদেরকে তাওফিক দেন-তারাই প্রকৃত ভাগ্যবান।

৫। পবিত্রতা প্রসঙ্গে

মুসলমানদের জীবনের ভিত্তি পবিত্রতার উপর। কারণ, মুসলমানকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হয়। নামাজের পূর্বশর্ত হলো- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পবিত্রতা। পবিত্রতা সম্পর্কে বহু মাসয়ালা মুজতাহিদ ইমামগণ উদ্ভাবন করেছেন এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পবিত্রতার প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা চলে আসছে। দ্বিতীয়তঃ হাদীসে পবিত্রতাকে নামাজের চাবি বলা হয়েছে।

৫.১। ইবাদাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো নামাজ। দলীল বা প্রমাণ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(ক) আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ- "যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ কায়েম করে।"

(খ) রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আস সালাতু ইমামুদ্দিন।" অপরে হাদীসে বর্ণিত আছে-কিয়ামতের ময়দানে সর্বাগ্রে প্রশ্ন করা হবে নামাজ সম্পর্কে।

(গ) সবচেয়ে অধিক পালনীয় বিষয় হলো নামাজ।

(ঘ) নামাজের মাধ্যমে মহান পালনকর্তার সাথে সরাসরি কথোপকথন হয়।

(ঙ) নামাজই একমাত্র ফরজ ইবাদাত যার আদেশ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সরাসরি আরশে নিয়ে শুনানো হয়েছে।

(চ) আল্লাহর দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ পূর্ণাঙ্গভাবে নামাজের মধ্যেই বিদ্যমান।

(ছ) নামাজ অন্যান্য সব মাখলুকের ইবাদতে সমন্বিত রূপ।

(জ) নামাজে ইসলামের অন্যান্য সকল ইবাদাত সংক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

৫.২। তাহারাত শব্দের ব্যাখ্যা

(ক) তাহারাত শব্দটি পরিচ্ছন্নতার অর্থে ব্যবহৃত হয়।
(খ) পরিভাষায় তাহারাত বলা হয়: শরীর থেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন ময়লা দূরীভূত করা।
(গ) তাহারাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো; তাহারাত ছাড়া যা বৈধ হয় না তা বৈধ হওয়া।
(ঘ) তাহারাত নামাজ বা এ জাতীয় ইবাদাত বৈধ করে।
(ঙ) তাহারাত পরকালে প্রতিদান স্বরূপ দোযখ মুক্তির আশ্বাস দেয়।

৫.৩। তাহারাতের প্রকারভেদ

সুফীয়ায়ে কেরামের মতে তাহারাত চার প্রকারঃ

<u>ইসলামে পবিত্রতা তথা তাহারাতের মূল্যায়ন</u>

পবিত্র দ্বীনে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া ছাড়াও স্বত্তাগতভাবে তা উদিষ্ট বিষয়।

আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ তায়ালা তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।” পবিত্রতার গুরুত্ব এই কথাতেই প্রমাণিত হয়ে যায়। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “আত্ব তুহুরু সাত্বরাল ঈমান” অর্থাৎ পবিত্রতা হলো ঈমানের অংশ বা অঙ্গ।” (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৫৫৬)। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রঃ) বলেছেন, “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।” কারণ অযুর সওয়াব বৃদ্ধি করা হলে এর পরিমাণ হয় ঈমানের সওয়াবের অর্ধেক। আর অযুর সওয়াব লাভ করা যেহেতু নির্ভর করে ঈমানের উপর এজন্য অযু বা পবিত্রতা অর্জনকে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। তদুপরি মহান আল্লাহর বাণীঃ “যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।” (সূরা মায়েদাঃ৬)

নাসাঈ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) বলেছেন,ঃ তোমাদের কেউ নিদ্রা হতে জাগ্রত হলে সে যেন তিনবার হাত ধেয়ার পূর্বে তার হাত পানিতে না প্রবেশ করায়। কেননা তোমাদের কারো জানা নেই যে, তার হাত রাত্রে কোথায় বিচরণ করেছিল। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর উভয় হাত ধোয়ার হুকুম সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার মতাদর্শীদের বিশ্লেষণ হলো, “যদি হাতে নাপাকী লেগে থাকার এক্বীন থাকে, তবে উভয় হাত ধৌত করা ফরজ। যদি প্রবল ধারণা হয়, তবে ওয়াজিব। যদি সন্দেহ হয় তবে সুন্নত। আর যদি সন্দেহও না হয় তবে মুস্তাহাব।

৫.৪। মিসওয়াক করা প্রসঙ্গে

নাসাঈ শরীফে উদ্ধৃত্ত হাদীসঃ "হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রিবেলা নামাজ পড়তে উঠলে মিসওয়াক দ্বারা তাঁর দাত মাজতেন।"

মিসওয়াকের জন্য তিক্ত গাছের মিসওয়াক সুন্নত। যেমন, -পিলু, নিম এবং যায়তুনের মিসওয়াক। মিসওয়াকের সুন্নত নিয়ম হলো, দাঁতে প্রস্তভাবে মিসওয়াক করবে। প্রথমে ডানদিকের উপরস্থ দাঁতে, এরপর বামদিকের উপরের দাঁতে। এরপর একইভাবে নিচের দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। ফকীহগণ লিখেছেন-মাসনুন মিসওয়াক থাকা সত্ত্বেও ব্রাশ, মাজন এবং অঙ্গুলী ঘর্ষণ দ্বারাও মিসওয়াক করার সুন্নত আদায় হবে।

মিসওয়াক করা আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক, না পথ প্রদর্শক, এ নিয়ে কিছু কথা।

৫.৫। রাত ও মিসওয়াক

আমেরিকার জনৈক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার একদা আমাকে বললেন, আপনি শয়নকালেও মিসওয়াক করবেন। তিনি বললেন, এর কারণ কি? উত্তরে ডাক্তার বললেন, বর্তমান যুগের গবেষণা বলে, মানুষ যা খায় তার ময়লা কুলির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার হয় না। আর সাধারণত মানুষের দাঁত নষ্ট হয় শয়নকালে। ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন করলেন, এর কারণ কী? ডাক্তার বললেন, আপনি প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, দিনে মানুষ কখনো কথা বলছে, কখনো খাবার খাচ্ছে,

আবার কখনো পান করছে। তাই দিনের বেলায় মুখের গতিশীলতার কারণে রক্ত লাসিকা তার কাজ করার সুযোগ পায়না। কিন্তু রাতের বেলায় যখন মুখ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সুযোগ হয়ে যায় কাজ করার। এ কারণেই দাঁত রাতের বেলায় অধিক খারাপ হয়। তাই শোয়ার সময় অবশ্যই মিসওয়াক করে ঘুমাবেন।

৫.৬ । নামাজের পূর্বে মিসওয়াক

নামাজ যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালার গুণগান করা, তাই নামাজের সময় মুখ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। তাছাড়াও নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় যদি নামাজী ব্যক্তির মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, তবে তার দ্বারা অন্য নামাজীদেরও কষ্ট হয়। তাই নামাজের পূর্বে মিসওয়াক দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে নেয়া উচিত।

৫.৬ । রোগজীবানু ও মিসওয়াক

মিসওয়াক হলো দুর্গন্ধ প্রতিষেধক। মিসওয়াক মুখের ভিতরের রোগ জীবানু ধ্বংস করে দেয়, ফলে নামাজী ব্যক্তি অসংখ্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, মিসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়। মিসওয়াকের মধ্যে থাকে ফসফরাস জাতীয় পদার্থ। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যে জমিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অধিক পরিমাণে বিদ্যমাণ থাকে, সেখানেই পিলু বিক্ষ বেশী জন্মে। দাঁতের প্রধান খাদ্যই হলো ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। আর বিশেষ করে পিলু বৃক্ষের যরে এ

উপাদানগুলো বেশী পাওয়া যায়। প্রমাণিত হয়েছে গবেষণায় যে, পিলু বৃক্ষের মিসওয়াক তাজা ও নরম অবস্থায় চাবালে তার মধ্য হতে বেরিয়ে আস তিক্ত ও তেজষ্ক্রিয় এক প্রকার পদার্থ।

এ পদার্থ রোগজীবানুর ক্রমবিকাশকে পতিহত করে এবং দাঁতগুলোকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। এমনিভাবে নীমের মিসওয়াকও দাঁতের সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। নাসাঈ শরীফে উদ্ধৃত হাদীসঃ হযরত শুরায়হ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রঃ) এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথমে কী করতেন? তিনি বলেন, মিসওয়াক করতেন।

৫.৭। স্বাভাবিক কর্ম

হাদীসঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের জন্য গোফ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভীর নীচের লোম চেঁছে ফেলা ও বগলের পশম উপড়ে ফেলার সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন এই কাজগুলো চল্লিশ দিনের বেশী সময় পর্যন্ত ফেলে না রাখি। রাবি বলেন, আরেক বার চল্লিশ রাতের কথাও বলেছেন।" (নাসাঈ শরীফ)।
হাদীসঃ "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা গোঁফ খাটো কর এবং দাঁড়ি বর্ধিত করো।"

দাঁড়ি রাখা ওয়াজীব। এ ব্যাপারে চার মাযহাবের উলামা থেকে মতৈক্য বর্ণিত আছে। পুরুষের জন্য এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়ি রাখা ওয়াজীব।

কোন শরয়ী ওজর ব্যতিরেকে দাঁড়ি মুন্ডানো হারাম। দাঁড়ি ছেঁটে এক মুষ্টির কম করে রাখা "মাকরূহে তাহরীমী।" এমন কাজে অভ্যস্ত হওয়া ফিসক। এটি একটি উম্মতে মুহাম্মাদী (সাঃ) এর উলামাদের সর্বস্বীকৃত এজমায়ী মাসয়ালা।

দাঁড়ি রাখা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত এবং মানবীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য তথা ফিতরাত।

হাদীসঃ হযরত রাফি ইবনে ইসহাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর মিসর অবস্থানকালে তাঁকে বলতে শুনেছেন- আল্লাহর কসম! আমি জানি না কিভাবে (মিসরের) এই টয়লেটগুলো ব্যবহার করব। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পেশাব ও পায়খানার উদ্দেশ্যে যাবে, তখন সে যেন ক্বিবলামুখী হয়ে ও ক্বিবলাকে পেছনে রেখে না বসে।" (নাসাঈ)

হাদীসঃ "কুতায়বা (রহঃ) ---- জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।" (নাসাঈ শরীফ)

হাদীসঃ "কুতায়বা (রহঃ) -----আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন (পায়খানা জন্য) ঢালু ভূমিতে যাবে, সে যেন তিনটি পাথর সাথে নিয়ে যায় এবং এগুলোর দ্বারা যেন সে পবিত্রতা অর্জন করে। এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে।" (নাসাঈ শরীফ)।

হাদীসঃ কুতয়বা (রহঃ) ---- আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ “তোমাদের স্বামীদেরকে পানি দ্বারা শৌচকার্য করতে বল। আমি নিজে তাদেরকে বলতে লজ্জাবোধ করি। রাসূল (সাঃ) এমনটি করতেন।” (নাসাঈ শরীফ)

হাদীসঃ কুতয়বা (রহঃ) ---- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ “যদি তোমাদের কারো পাত্র থেকে কুকুর পান করে তবে সে যেন তার পাত্রটি সাতবার ধৌত করে।” (নাসাঈ শরীফ)।

৫.৮ । ওযুর হিকমত

১। ওযু মানুষকে বাহ্যিক ও গোপন পাপ এবং অলসতা ও উদাসীনতা বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে। নামাজ যদি ওযু ছাড়া বৈধ হত তবে মানুষ অলসতার মধ্যে ডুবে থাকত এবং গাফেল অন্তর নিয়েই নামাজ আদায় করত। ওযুর বিধান এজন্যেই এসেছে যেন মানুষ সচেতনভাবে ও নিবিষ্ট চিত্তে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়।

২। গবেষণায় পাওয়া গেছে, মানুষের অন্তরের বিষাক্ত পদার্থসমূহ দেহের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বের হয়ে থাকে। অতঃপর এগুলো হাত, পা, মুখ ও মাথার উপর এসে থেকে যায়। ফলে বিভিন্ন ধরণের বিষাক্ত ফোঁড়া ও টিউমার প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেহের ঐ অংশসমূহ ধৌত করার ফলে ময়লা ও বিষাক্ত পদার্থ সমূহ দূরীভূত হয়ে যায়।

৩। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের নিয়তে তথা তাঁর বিধান পালনের উদ্দেশ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে মহব্বত করেন।"

৪। যখন পবিত্রতার গুণ অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন এতে আধ্যাত্মিক শক্তি স্থায়ী হয়ে যায়। ফলে নাফসানী শক্তি বা ইন্দীয়জাত খারাপ দোষ হ্রাস পায়।

৫। পবিত্রতার দ্বারা মানব প্রকৃতিতে বিবেকের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর বিবেকের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর বিবেক যখন পরিপূর্ণ হবে, তখন আল্লাহর সান্নিধ্যও পূর্ণতা লাভ করবে।

৬। গোনাহ ও অলসতার কারণে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে রূহানী নূর ও প্রশান্তি দূর হয়ে যায়, ওযু করার কারণে পুনরায় রূহানিয়াত ও এতমিনান অন্তরে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফিরে আসে। এই রূহানী নূরই কিয়ামতের দিন ওযুর অঙ্গসমূহে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে প্রকাশিত হবে। এ প্রসঙ্গে হুজুর (সাঃ) বলেন, "নিশ্চয় কেয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতগণ আগমণ করবে তখন ওজুর কারণে তাদের হাত, পা, এবং চেহারা উজ্জ্বল থাকবে। সুতরাং যারা নিজের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করতে চায়, তারা যেন তা বৃদ্ধি করে নেয়।" (নাসাঈ শরীফ)

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে-"যে পর্যন্ত ওযুর পানি পৌঁছবে, মোমিন বান্দাকে সে পর্যন্ত বেহেশতের অলংকার পরিধান করানো হবে।"

৭। পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের ফেরেশতাদের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং এর দ্বারা সে আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। কেননা, পবিত্রতার কারণে শয়তান হতে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়।

৮। নামাজ একটি মর্যাদা সম্পন্ন আল্লাহর বিধান। সেজন্য এই ইবাদাত বা বিধান আদায়ের জন্য ওযু বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "ওযু হলো নামাজের চাবি।"

৯। অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, হাত পা ধৌত করা এবং মুখ ও মাথায় পানি ছিটানোর ফলে মনের উপর এক বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রধান প্রধান অঙ্গ সমূহে এক প্রকার শক্তি ও চেতনা সৃষ্টি হয়। এতে উদাসীনতা, তন্দ্রা ও সংজ্ঞাহীনতা দূরীভূত হয়।

১০। যখন ওযু দ্বারা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গসমূহ পবিত্র হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এটা চায় যে, তার অন্তরও যেন তেমনি পত্রি হয়ে যায়। কিন্তু এতে আল্লাহর কুদরতের হাত ছাড়া অন্য কারো হাত নেই। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য আল্লাহর দরবারে ওযুর পর দোয়া করে বলা হয়- "হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর।"

১১। পবিত্রতা প্রসঙ্গে আরো অনেক কিছু লেখা যায়। কিন্তু আমি এখানেই শেষ করছি এই বলে যে-"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার খাঁটি বান্দা বানিয়ে নাও।

৬। সুন্নাহর স্পর্শ

নবীজী (সাঃ) এর সুন্নাহ হচ্ছে একটি সুসংহত ও সমন্বিত পন্থা। এতে রয়েছে ঈমান ও ইলম; ওহি এবং এর প্রেক্ষাপটের অপূর্ব সমন্বয়। সব মিলিয়ে সুন্নাহসম্মত পথ হয়েছে নুরুন আলা নুর অর্থাৎ সোনায় সোহাগা। সুন্নাহয় আছে নৈতিক ও আইনি বিধানের ভারসাম্য। এটা সুনিশ্চিত যে, ভারসাম্য বজায় রেখে জীবন চালানোতেই রয়েছে মহা সাফল্য। এজন্যে চাই সমন্বয় সাধনের আসবাব। সেটি হলো নিক্তি বা মীযান। আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক কায় কারবারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরে। এই ইনসাফ কায়েমেও চাই মীযান বা দাঁড়িপাল্লা। আল্লাহ তায়ালা সূরা আর্ রাহমানে বলেন, "তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড, যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদন্ডে।" (কুরআন, ৫৫: ৭-৮)। এখানে তুলাদন্ডের ভূমিকা হলো প্রতিটি বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে মানুষকে বাধ্য করা। তাই সুন্নাহয় রয়েছে পেশিশক্তি ও এর যথার্থ প্রয়োগ। যেখানে কর্তৃত্ব নিশ্চিত হয় কুরআনের মাধ্যমে ধর্মের আলোকে। এজন্যেই পৃথিবীতে রয়েছে দু'ধরনের শক্তি। যদি কেউ ইসলামের আইনি কাঠামোর বিরোধিতা করে তাকে শাস্তি দিতে হয় রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে।

নবীজী (সাঃ) ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়েও কাজ করেছেন। তিনি সালাতের ইমামতির পাশাপাশি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতেন। মানুষের মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয়াদির মীমাংসা করে দিতেন; পাশাপাশি প্রশাসনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মোটেও ইসরাইলিদের পন্থায় কোন কাজ করতেন না। তিনি হেদায়েতের কাজ করতেন। আবার ধর্মের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতেন।

আল্লাহ তায়ালা যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের কেউই রাজনীতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করেন নি। একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র হবে আল্লাহময়। আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত দোয়া করতে আমাদের বলেছেন। দোয়াঃ "নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবাণী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য; যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোন শরিক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।" (কুরআন, ৬ঃ ১৬২-১৬৩)।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য নাযিল করেছেন আল কুরআন। আর কর্মের জন্য দিয়েছেন লৌহ। আল্লাহ বলেন, "আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি আর তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও সত্য-মিথ্যার মানদন্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি অবতীর্ণ করেছি লৌহ, যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানাবিধ উপকার।" (কুরআন, ৫৭ঃ২৫)। অন্যত্র বলেছেন, "আর পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ঠ।" (কুরআন, ২৫ঃ৩১)।

তো সুন্নাহয় রয়েছে ধর্ম ও রাজনীতি তথা আল্লাহর দাসত্ব ও মানুষের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

সুতরাং কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, সুন্নাহ একটি বাস্তবপন্থি পন্থা। সুন্নাহ মানুষকে একান্তই মানুষ হিসেবে গণ্য করে, যে পানাহার করে, ঘরে থাকে ঘর বানিয়ে, বাজারে যায় সওদা করতে, রয়েছে

আরো প্রয়োজন ও চাহিদা। এই মানুষই আবার পরিশেষে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লোভের চেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং সকল হলে জান্নাতে ঠাই পাবে।

মানুষকে আল্লাহ একাধারে দুর্বল ও শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন। শ্রম দুই ধরণের; পার্থিব জীবনের জন্য শ্রম, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য শ্রম। তাইতো দেখা যায়- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দিনের বেলা রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিশ্রম করতেন এবং যোহর ও আসরের নামাজও পড়তেন। এই রাসূল (সাঃ) আবার শত কষ্ট হলেও রাত্রিতে কম ঘুমিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে রাত্রির অর্ধাংশ বা এক তৃতীয়াংশ সালাতে মগ্ন থাকতেন।

তো সুন্নাহ মানুষকে একাধারে মুজাহিদ ও আব্দ হিসাবে জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়। বিষয়টি যতই কঠিন মনে হোক, আসলে সুন্নাহর প্রতিটি বিধান সহজসাধ্য। আর নবীজী(সাঃ) এর প্রধান দায়িত্বই ছিল মানুষের বোঝা লাঘব করা। আল্লাহ বলেন, “যে তাদের সৎকাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎকাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্ত হারাম করে। আর তাদের বোঝা ও শৃঙ্খল-যা তাদের উপর ছিল-অপসারণ করে।” (কুরআন, ৭ঃ১৫৭)।

তাই সুন্নতের মধ্যে এমন কোন বিধান নেই, যা মানুষকে বাধাগ্রস্ত করে, মানষকে সংকীর্ণ অবস্থায় ফেলে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেই বলেছেন- “আমি তোমাদের ওপর রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।”

এই কথাটি কুরআনেও রয়েছে “আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য পাঠিয়েছি কেবল রহমত হিসেবে।” (কুরআন, ২১:১০৭)।

তিনি আবু মুসা ও মুয়াজ (রাঃ) কে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। সেসময় তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, "সবার জন্য সবকিছু সহজ করবে; কঠিন করবে না। মানুষকে আশার বাণী শোনাবে; হাতাশা ছড়াবে না। একে অপরের সঙ্গে সুন্দর সহাবস্থান নিশ্চিত করবে; মত পার্থক্য সৃষ্টি করবে না।"

তাছাড়া সামগ্রিকভাবে তিনি তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন- "সবার জন্য সবকিছু সহজ করবে; কঠিন করবে না।"

আল্লাহও বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা চাপিয়ে দিতে চান না।" (কুরআন, ৫ঃ৬)। ইসলামের প্রতিটি শাখা প্রশাখা যে মহাকেন্দ্রে গিয়ে মিলেছে-সেটি হচ্ছে আল কুরআন। আর যেহেতু ইসলামী বিধি বিধান বুঝিয়ে দিয়েছেন নবীজী (সাঃ)-সেহেতু সুন্নাহ ও আল কুরআন একই মুদ্রার দুটি পিঠ- যে পিঠদ্বয়ে একই চিত্র সমন্বিতরূপে ঠাই পেয়েছে।

তবুও কথা থেকে যায়। মানুষ ভবিষ্যত নিয়ে ভাবিত হয়। কারণ সে জানে না কী অপেক্ষা করছে তার জন্য। প্রত্যেক যুগেই দেখা গেছে, সম্পদশালী কখনো নিঃস্ব হয়ে যায়, হাসি খুশি ব্যক্তি কখনো বিমর্ষ হয়ে পড়ে। নিরাপদজনও কখনো ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। ভালোবাসার প্রিয় মানুষেরাও একসময় পৃথিবী ছেড়ে পরলোকে চলে যায়।

এই অজ্ঞাত শংকা থেকে মুক্তি পেতে হলে- একমাত্র উপায়, আল্লাহর উপর আস্থাকে সুদৃঢ় করা। তবেই নিশ্চিতভবে জীবন চালানো যাবে;

আর তখন বুঝেও আসবে যে, আমাদের রব আমাদের অমঙ্গল করবেন না।

আল্লাহ মানুষের কাছে চান-'রিযা বিল কাযা' তথা তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি। এটি হয় বিষয়টি ঘটে যাবার পর। এটি কার্যকারণ সূত্রের একটি অবস্থা। অর্থাৎ এটি একটি ফলাফল -যা অর্জন করতে হয়। আর এটির সম্পর্ক হলো মনের সাথে, তাই মানুষ চাইলে 'রিযা বিল কাযা' অর্জিত হয়ে যায়না। তাই প্রশ্ন হলো-এইটা অর্থাৎ তাকদিরে সন্তুষ্টি কী করে বান্দার কাছে চাওয়া হয়? এর সরল জবাব হলো-আপনার পক্ষে যা সম্ভব তা করুন। মনকে বলুন, "আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে অবিচল আস্থাশীল হতে হবে রে মন।" সুন্নাহ থেকে আমরা জানতে পারি,"ভবিষ্যত আমাদের জন্য কল্যাণই বয়ে আনবে।" এজন্যেই শোকর ও সবরের প্র্যাকটিস করতে হবে।

আল্লাহ বলেন,"আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিত কোন বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।" (কুরআন, ৬৪ঃ১১)।

সুতরাং বিপদাপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ও পরলোকে আল্লাহর ক্ষমা পাবার জন্য নিয়মিত ধর্মচর্চা করতে হবে। এটাই আমরা পাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনাচরণে। হাদীসঃ "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল সেটি যা নিয়মিত করা হয়; যদিও সে আমল সামান্যই হয়।" (বুখারীঃ ৬৪৬৪)।
আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

৭। আসমায়ে রাসূল (সাঃ)

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর সিফাতি নামসমূহ মনের কোনায় গেঁথে রাখলে সুন্নাহকে বুঝাও যায় আর মানাও যায়। আমি অন্যত্র লিখেছি- আল্লাহর আসমাউল হুসনা অসংখ্য তবে মাত্র ৯৯টি নাম আমাদের জানানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার এই ৯৯টি নাম নিয়ে চিন্তা ফিকির করলে আল্লাহকে চেনা যায়, বুঝা যায়। তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য নাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক। বিধায় এই অধ্যায়ে আমি ব্যাখ্যায় না গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নামে উল্লেখ করবো। আশা করি পাঠক, অতঃপর এই নামগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে সুন্নাহর মর্ম ও সুন্নাহর প্রজ্ঞা বুঝতে সক্ষম হবেন। তো শুরু করা যাক।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নাম সমূহঃ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। হে আল্লাহ! দরূদ ও সালাম পেশ করুন এবং বরকত দান করুন তাঁর প্রতি যার নাম মোবারক হলো আমাদের সর্দার হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও

১। সাইয়্যেদুনা আহমদ (সাঃ)
২। সাইয়্যেদুনা হামিদ (সাঃ)
৩। সাইয়্যেদুনা মাহমুদ (সাঃ)
৪। সাইয়্যেদুনা আহীদ (সাঃ)
৫। সাইয়্যেদুনা ওয়াহীদ (সাঃ)
৬। সাইয়্যেদুনা মাহিন (সাঃ)

৭। সাইয়্যেদুনা হাশিরুন (সাঃ)
৮। সাইয়্যেদুনা আক্বীব (সাঃ)
৯। সাইয়্যেদুনা ত্বোয়াহা (সাঃ)
১০। সাইয়্যেদুনা ইয়া-সীন (সাঃ)
১১। সাইয়্যেদুনা তাহির (সাঃ)
১২। সাইয়্যেদুনা মুতাহ্হার (সাঃ)
১৩। সাইয়্যেদুনা তাইয়েব (সাঃ)
১৪। সাইয়্যেদুনা সাইয়্যিদ (সাঃ)
১৫। সাইয়্যেদুনা রাসূল (সাঃ)
১৬। সাইয়্যেদুনা নাবী (সাঃ)
১৭। সাইয়্যেদুনা রাসূলুর রাহমাত (সাঃ)
১৮। সাইয়্যেদুনা ক্বায়্যিম (সাঃ)
১৯। সাইয়্যেদুনা জামি (সাঃ)
২০। সাইয়্যেদুনা মুক্বতাফ (সাঃ)
২১। সাইয়্যেদুনা মুক্বাফ্যি (সাঃ)
২২। সাইয়্যেদুনা রাসূলুল মালাহিম (সাঃ)
২৩। সাইয়্যেদুনা রাসূলুর রাহাত (সাঃ)
২৪। সাইয়্যেদুনা কামিল (সাঃ)
২৫। সাইয়্যেদুনা ইকলিল (সাঃ)
২৬। সাইয়্যেদুনা মুদ্দাস্সির (সাঃ)
২৭। সাইয়্যেদুনা মুয্থাম্মিল (সাঃ)
২৮। সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ (সাঃ)
২৯। সাইয়্যেদুনা হাবীবুল্লাহ (সাঃ)
৩০। সাইয়্যেদুনা সাফিয়্যু (সাঃ)
৩১। সাইয়্যেদুনা নাজিয়ুল্লাহ (সাঃ)

৩২। সাইয়্যেদুনা কালিমুল্লাহ (সাঃ)
৩৩। সাইয়্যেদুনা খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ)
৩৪। সাইয়্যেদুনা খাতামুর রুসূল (সাঃ)
৩৫। সাইয়্যেদুনা মুহ্য়ি (সাঃ)
৩৬। সাইয়্যেদুনা মুনজি (সাঃ)
৩৭। সাইয়্যেদুনা মুযাক্কির (সাঃ)
৩৮। সাইয়্যেদুনা না-সির (সাঃ)
৩৯। সাইয়্যেদুনা মানসুর (সাঃ)
৪০। সাইয়্যেদুনা নাবিয়্যুর রাহমাত (সাঃ)
৪১। সাইয়্যেদুনা নাবিয়্যুত তাওবাহ (সাঃ)
৪২। সাইয়্যেদুনা হারিস (সাঃ)
৪৩। সাইয়্যেদুনা মা'লুম (সাঃ)
৪৪। সাইয়্যেদুনা শাহির (সাঃ)
৪৫। সাইয়্যেদুনা শা-হিদ (সাঃ)
৪৬। সাইয়্যেদুনা শাহীদ (সাঃ)
৪৭। সাইয়্যেদুনা মাশহুদ (সাঃ)
৪৮। সাইয়্যেদুনা বাশীর (সাঃ)
৪৯। সাইয়্যেদুনা মুবাশ্শির (সাঃ)
৫০। সাইয়্যেদুনা নাযীর (সাঃ)
৫১। সাইয়্যেদুনা মুনযির (সাঃ)
৫২। সাইয়্যেদুনা নূর (সাঃ)
৫৩। সাইয়্যেদুনা সিরাজ (সাঃ)
৫৪। সাইয়্যেদুনা মিসবাহ্ (সাঃ)
৫৫। সাইয়্যেদুনা হুদা (সাঃ)
৫৬। সাইয়্যেদুনা মাহদী (সাঃ)

৫৭। সাইয়্যেদুনা মুনীর (সাঃ)
৫৮। সাইয়্যেদুনা দা-য়ী (সাঃ)
৫৯। সাইয়্যেদুনা মাদয়ু' (সাঃ)
৬০। সাইয়্যেদুনা মুজীব (সাঃ)
৬১। সাইয়্যেদুনা মুজাব (সাঃ)
৬২। সাইয়্যেদুনা হাফী (সাঃ)
৬৩। সাইয়্যেদুনা আ'ফু (সাঃ)
৬৪। সাইয়্যেদুনা ওয়ালি (সাঃ)
৬৫। সাইয়্যেদুনা হাক্ক (সাঃ)
৬৬। সাইয়্যেদুনা ক্বাবিয়্যু (সাঃ)
৬৭। সাইয়্যেদুনা আমীন (সাঃ)
৬৮। সাইয়্যেদুনা মা'মুন (সাঃ)
৬৯। সাইয়্যেদুনা কারীম (সাঃ)
৭০। সাইয়্যেদুনা মুকাররাম (সাঃ)
৭১। সাইয়্যেদুনা মাকিন (সাঃ)
৭২। সাইয়্যেদুনা মাতীন (সাঃ)
৭৩। সাইয়্যেদুনা মুবীন (সাঃ)
৭৪। সাইয়্যেদুনা মুয়াম্‌মিল (সাঃ)
৭৫। সাইয়্যেদুনা ওয়াসিল (সাঃ)
৭৬। সাইয়্যেদুনা যু-ক্কুওয়াত (সাঃ)
৭৭। সাইয়্যেদুনা যু-হুরমাত (সাঃ)
৭৮। সাইয়্যেদুনা যু-মাকানাত (সাঃ)
৭৯। সাইয়্যেদুনা যু-ঈয্‌যী (সাঃ)
৮০। সাইয়্যেদুনা যু-ফাযলিন (সাঃ)
৮১। সাইয়্যেদুনা মুত্বাঅুন (সাঃ)

৮২। সাইয়্যেদুনা মুতীয়ুন (সাঃ)
৮৩। সাইয়্যেদুনা ক্বাদামু ছিদ্‌ক (সাঃ)
৮৪। সাইয়্যেদুনা রাহমাত (সাঃ)
৮৫। সাইয়্যেদুনা বুশরা (সাঃ)
৮৬। সাইয়্যেদুনা গাউছ (সাঃ)
৮৭। সাইয়্যেদুনা গাইছ (সাঃ)
৮৮। সাইয়্যেদুনা গিয়াছ (সাঃ)
৮৯। সাইয়্যেদুনা নি'মাতুল্লাহ্‌ (সাঃ)
৯০। সাইয়্যেদুনা হাদিয়্যা তুল্লাহ (সাঃ)
৯১। সাইয়্যেদুনা উরওয়তুল উছক্বা (সাঃ)
৯২। সাইয়্যেদুনা সিরাতুল্লাহ (সাঃ)
৯৩। সাইয়্যেদুনা সিরাতুল মুস্তাক্বীম (সাঃ)
৯৪। সাইয়্যেদুনা যিকরুল্লাহ (সাঃ)
৯৫। সাইয়্যেদুনা সাইফুল্লাহ (সাঃ)
৯৬। সাইয়্যেদুনা হিয্‌বুল্লাহ (সাঃ)
৯৭। সাইয়্যেদুনা নাজমুস সাক্বিব (সাঃ)
৯৮। সাইয়্যেদুনা মুস্তাফা (সাঃ)
৯৯। সাইয়্যেদুনা মুজতাবা(সাঃ)
১০০। সাইয়্যেদুনা মুনতাক্বা (সাঃ)
১০১। সাইয়্যেদুনা উম্মি (সাঃ)
১০২। সাইয়্যেদুনা মুখতার (সাঃ)
১০৩। সাইয়্যেদুনা আজির (সাঃ)
১০৪। সাইয়্যেদুনা জাব্বার (সাঃ)
১০৫। সাইয়্যেদুনা আবুল ক্বাসিম (সাঃ)
১০৬। সাইয়্যেদুনা আবুত-তাহির (সাঃ)

১০৭। সাইয়্যেদুনা আবুত তায়্যিব (সাঃ)
১০৮। সাইয়্যেদুনা আবু ইবরাহিম (সাঃ)
১০৯। সাইয়্যেদুনা মুশাফ্‌ফাঅ (সাঃ)
১১০। সাইয়্যেদুনা শাফীয়ুন (সাঃ)
১১১। সাইয়্যেদুনা সালেহ (সাঃ)
১১২। সাইয়্যেদুনা মুসলিহ্ (সাঃ)
১১৩। সাইয়্যেদুনা মুহাইমিন (সাঃ)
১১৪। সাইয়্যেদুনা সাদিক্ব (সাঃ)
১১৫। সাইয়্যেদুনা মুসাদ্দার (সাঃ)
১১৬। সাইয়্যেদুনা সিদক্ব (সাঃ)
১১৭। সাইয়্যেদুনা সায়্যিদুল মুরসালীন (সাঃ)
১১৮। সাইয়্যেদুনা ইমামুল মুত্ত্বাক্বীন (সাঃ)
১১৯। সাইয়্যেদুনা ক্বায়িদুল গুররিল মুহাজ্জালীন (সাঃ)
১২০। সাইয়্যেদুনা খালিলুর রাহমান (সাঃ)
১২১। সাইয়্যেদুনা বার্‌রুন (সাঃ)
১২২। সাইয়্যেদুনা মুবিররুন (সাঃ)
১২৩। সাইয়্যেদুনা ওয়াজিহ্ (সাঃ)
১২৪। সাইয়্যেদুনা নাসিহ্ (সাঃ)
১২৫। সাইয়্যেদুনা না-সিহ্ (সাঃ)
১২৬। সাইয়্যেদুনা ওয়াকিল (সাঃ)
১২৭। সাইয়্যেদুনা মুতাওয়াক্‌কিল (সাঃ)
১২৮। সাইয়্যেদুনা কাফিল (সাঃ)
১২৯। সাইয়্যেদুনা শাফিক্ব (সাঃ)
১৩০। সাইয়্যেদুনা মুক্বীমুস্ সুন্নাহ্ (সাঃ)
১৩১। সাইয়্যেদুনা মুক্বাদ্দাস (সাঃ)

১৩২। সাইয়্যেদুনা রুহুল ক্বুদুস (সাঃ)
১৩৩। সাইয়্যেদুনা রুহুল হাক্ব (সাঃ)
১৩৪। সাইয়্যেদুনা রুহুল ক্বিস্ত্ব (সাঃ)
১৩৫। সাইয়্যেদুনা কা-ফি (সাঃ)
১৩৬। সাইয়্যেদুনা মুকতাফি (সাঃ)
১৩৭। সাইয়্যেদুনা বা-লিগুন (সাঃ)
১৩৮। সাইয়্যেদুনা মুবাল্লিগ (সাঃ)
১৩৯। সাইয়্যেদুনা শা-ফী (সাঃ)
১৪০। সাইয়্যেদুনা ওয়াসিল (সাঃ)
১৪১। সাইয়্যেদুনা মাউসুল (সাঃ)
১৪২। সাইয়্যেদুনা সাবিক্ব (সাঃ)
১৪৩। সাইয়্যেদুনা সা-য়িক্ব (সাঃ)
১৪৪। সাইয়্যেদুনা হাদী (সাঃ)
১৪৫। সাইয়্যেদুনা মুহদি (সাঃ)
১৪৬। সাইয়্যেদুনা মুক্বাদ্দাস (সাঃ)
১৪৭। সাইয়্যেদুনা আযীয (সাঃ)
১৪৮। সাইয়্যেদুনা ফাদিল (সাঃ)
১৪৯। সাইয়্যেদুনা মুফাজ্জাল (সাঃ)
১৫০। সাইয়্যেদুনা ফা-তিহ্ (সাঃ)
১৫১। সাইয়্যেদুনা মিফতাহ (সাঃ)
১৫২। সাইয়্যেদুনা মিফতাহুর রাহমাত (সাঃ)
১৫৩। সাইয়্যেদুনা মিফাতাহুল জান্নাত (সাঃ)
১৫৪। সাইয়্যেদুনা আ'লামুল ঈমান (সাঃ)
১৫৫। সাইয়্যেদুনা আ'লামুল ইয়াক্বীন (সাঃ)
১৫৬। সাইয়্যেদুনা দালিলুল খাইরাত (সাঃ)

১৫৭। সাইয়্যেদুনা মুসাহ হিহুল হাসানাত (সাঃ)
১৫৮। সাইয়্যেদুনা মুক্বীলুল আ’ছারাত (সাঃ)
১৫৯। সাইয়্যেদুনা সাফুহুন আনিয যাল্লাত (সাঃ)
১৬০। সাইয়্যেদুনা সাহিবুস শাফায়াত (সাঃ)
১৬১। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল মাক্বাম (সাঃ)
১৬২। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল ক্বাদাম (সাঃ)
১৬৩। সাইয়্যেদুনা মাখছুছুম বিল ইয্‌যি (সাঃ)
১৬৪। সাইয়্যেদুনা মাখছুছুম বিল মাজদ (সাঃ)
১৬৫। সাইয়্যেদুনা মাছুছুম বিশ শার্‌ফ (সাঃ)
১৬৬। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল ওয়াসিলাহ (সাঃ)
১৬৭। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল সাইফ (সাঃ)
১৬৮। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল ফাদ্বিলাহ (সাঃ)
১৬৯। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল ইযার (সাঃ)
১৭০। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল হুজ্জাত (সাঃ)
১৭১। সাইয়্যেদুনা সাহিবুস সুলতান (সাঃ)
১৭২। সাইয়্যেদুনা সাহিবুর রিদা (সাঃ)
১৭৩। সাইয়্যেদুনা সাহিবুদ দারাজাতির রাফিয়া (সাঃ)
১৭৪। সাইয়্যেদুনা সাহিবুত তাজ (সাঃ)
১৭৫। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল মিগফার (সাঃ)
১৭৬। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল লিওয়াহ (সাঃ)
১৭৭। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল মি’রাজ (সাঃ)
১৭৮। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল ক্বাদিব (সাঃ)
১৭৮। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল বুরাক্ব (সাঃ)
১৭৯। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল খা-তাম (সাঃ)
১৮০। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল আ’লামাত (সাঃ)

১৮১। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল বুরহান (সাঃ)
১৮২। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল বায়ান (সাঃ)
১৮৩। সাইয়্যেদুনা ফাসিহুল লিসান (সাঃ)
১৮৪। সাইয়্যেদুনা মুতাহ্ হারুল জানান (সাঃ)
১৮৫। সাইয়্যেদুনা রাউফ (সাঃ)
১৮৬। সাইয়্যেদুনা রাহিম (সাঃ)
১৮৭। সাইয়্যেদুনা উযুনু খাইর (সাঃ)
১৮৮। সাইয়্যেদুনা সাহিহুল ইসলাম (সাঃ)
১৮৯। সাইয়্যেদুনা ছায়্যিদুল কাওনাইন (সাঃ)
১৯০। সাইয়্যেদুনা আইনুন নাঈম (সাঃ)
১৯১। সাইয়্যেদুনা আইনুল গুর্ (সাঃ)
১৯২। সাইয়্যেদুনা সা'দুল্লাহ্ (সাঃ)
১৯৩। সাইয়্যেদুনা সা'দুল খালক্ব (সাঃ)
১৯৪। সাইয়্যেদুনা খাতিবুল উমাম (সাঃ)
১৯৫। সাইয়্যেদুনা আ'লামুল হুদা (সাঃ)
১৯৬। সাইয়্যেদুনা কাশিফুল কুরাব (সাঃ)
১৯৭। সাইয়্যেদুনা রা'ফিউর রুতাব (সাঃ)
১৯৮। সাইয়্যেদুনা ইয্ফুল আরাব (সাঃ)
১৯৯। সাইয়্যেদুনা সাহিবুল ফারাজ (সাঃ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালা আলিহি।

৮। শেষ কথা

এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যা লেখা হলো তা আমার নিজস্ব কোন আবিস্কার নয়। এখানে ঠাই পেয়েছে প্রজ্ঞা বা হিকমাহ যা আল কুরআন ও সুন্নতে রাসূলের (সাঃ) মধ্যে পাওয়া যায়। সবতো আর লেখা সম্ভব নয়। তাই আমার অন্তরের চাহিদা মতোই লিখেছি।

আল্লাহ তায়ালা গায়েব বা অদৃশ্য। কিন্তু অন্যদিকে তিনি দৃশ্যমানও । মহাবিশ্বের অস্তিত্বই জানান দিচ্ছে যে- তার অস্তিত্বের পেছনে একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি ইসলামী নাম- আল্লাহ নামে আমাদের সকলের কাছে পরিচিত।

আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কুশলী এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে যেকোন কিছুকে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম। কিন্তু মহাবিশ্ব তিনি সৃষ্টি করেছেন ছয়টি পর্যায়ের ছয়টি মহাকালে। এর কারণ আর কিছু নয় এছাড়া যে- তিনি পৃথিবীর মত বৈচিত্র্য ভরপুর এক গ্রহে মানুষের পত্তন ঘটাবেন। হ্যাঁ- আল্লাহ এক মুহূর্তেই তা করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্ত তিনি চাননি যে- এত দ্রুত এত বিশাল এক মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে পৃথিবীকে তার মধ্যে স্থাপন করবেন। বরং তিনি বৈজ্ঞানিক নীতিমালার জনক হয়ে, বিজ্ঞানকে তাঁর অন্যতম সৃষ্টি বলে পরিচিত করাতে চেয়েছেন বুদ্ধিমান মানুষের কাছে। মানুষের ক্ষমতা খুবই কম। তার মস্তিস্কও তত উন্নত নয়। তবুও সেই মানুষকেই আল্লাহ সৃষ্টির সেরা জীব বলেছেন।

জীবন ও মৃত্যুর গমনাগমণে চলে পৃথিবীর মানুষের জীবন। তার প্রয়োজন হয় লৌহের, ইউরেনিয়ামের ও আরো শত প্রকার কণার সমন্বয়ে গঠিত পদার্থের। এসব তিনি একেকটিকে একক কারখানায় তৈরী করেছেন। সাধারণতঃ সেগুলো হলো নক্ষত্রের ভেতর মিথষ্ক্রিয়া। অনেক নক্ষত্র ভারী থেকে ভারী পদার্থ তৈরী করে এবং গ্রাভিটি ও তাপচাপের কাছে পরাজিত হয়ে বিস্ফোরিত হয়। এগুলোকে বলে সুপারনোভা। সুপারনোভা বিস্ফোরণে নক্ষত্রের অভ্যন্তরস্থ ভারী পদার্থ সেসব লৌহ-মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর গ্রাভিটির কারণে সেসব পদার্থ একসঙ্গে জুড়তে থাকে ভারী অজৈব ও জৈব উপাদান। কিন্তু যে নক্ষত্র এসবের যোগান দেয় তাতে কোন প্রাণীর জীবন ধারণ অসম্ভব। প্রাণী তথা মানুষের মত জীবের জন্য শীতল ও অন্ধকারের বাসিন্দা পৃথিবীর মত গ্রহ প্রয়োজন। এজন্যেই বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতি আল্লাহ সৃষ্টি করে তার আওতায় ভারী পদার্থ সৃষ্টি করে- ঐসব দিয়ে পৃথিবীর মত গ্রহ বানিয়েছেন যেখানে মানুষের জীবন ধারণ সম্ভব হয়। মহাবিশ্বটাকে আমরা যেমন দেখি- তেমন না হলে মানুষের পৃথিবীতে অবস্থান অসম্ভব হয়ে যেত।

আরেকটি কথা। আল্লাহর পরই মানুষ মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় চরিত্র। মানুষের জন্য পৃথিবী, মানুষের জন্যই মহাবিশ্ব। বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের নামে একটি হাইপোথিসিস বা প্রিন্সিপল মতে মানুষ মহাবিশ্বে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় নেই। কিন্তু আল কুরআন বলে, মানুষই সৃষ্টির মধ্যে কেদ্রিয় সৃষ্টি। অবশ্য অধুনা অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হতবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, কোপারনিকাস প্রিন্সিপল মরে যাচ্ছে। কেননা- শত শত বছরের বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রায় ও অনুসন্ধানে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

তবে আল্লাহর সৃষ্টি অনেক । তিনি অনেক ধরণের প্রাণীই সৃষ্টি করেছেন এবং করে চলেছেন। কিন্তু মানুষ অনুপম। মানুষের মত সৃষ্টি আর কেউ নয়, কেউ দেখেনি, কেউ শোনেনি, কেউ প্রমাণ দিতে পারে নি যে, মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব আর কোথাও আছে। সবাই শুধু সম্ভাবনার কথা বলে। অর্থাৎ থাকা সম্ভব। কিন্তু এই সম্ভবটি অসম্ভবই থেকে গেছে।

সুতরাং মানুষ ভাগ্যবান। কিন্তু মানুষের রয়েছে ভালো দিক ও মন্দ দিক। ভালোর টানে যে চলে সে স্রষ্টার সন্তোষভাজন। মন্দের টানে যে চলে সে স্রষ্টাকে করে অসন্তুষ্ট।

আমাদের কাজ হলো- আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং আল্লাহর কাছ থেকে সেই সন্তোষের পুরস্কার স্বরূপ আখেরাতে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ নেয়া। আল্লাহ একথাই বারংবার বলেছেন কুরআনে। নবীকারীম (সাঃ) আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। তিনি আমাদের সর্দার। আল্লাহ বলেন-হে মানুষ, তোমাদের জন্য রাসূলের কাছে রয়েছে উত্তম আদর্শ জীবনের মূর্তরূপ। তাই মোহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ করেই আমাদেরকে জীবনযাপন করতে হবে। আল্লাহ এমন মানুষদের অন্তরে প্রশান্তি দেন। শেষ পরিণতি যদি প্রশান্তির হয়-তাহলে আমরা সফলকাম। আল্লাহ মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, “হে প্রশান্ত মন! চলো নিজ পালনকর্তার কাছে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, আর তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে যুক্ত হও, আর প্রবেশ করো আমার (রচিত) বেহেশতে।”

তাই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রজ্ঞাকে নিজের মধ্যে লালন ও ধারণ করতে হবে। তবেই আমাদের সকল কাজ আল্লাহর বন্দেগীতে রূপান্তর করা যাবে। তখন উপর্যুক্ত আয়াত আমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। আমরা সাফল্য লাভ করবো। যাবো চিরকালের জন্য জান্নাতে। অন্যথায়, রয়েছে শাস্তি যা উৎ পেতে আছে দোযখের আকৃতিতে। আল্লাহ আমাদের দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

পার্থিব জীবন গড়ে নেয়া আমাদের খুব প্রয়োজন। এজন্যে এখন থেকেই মগ্ন হতে হবে ইবাদাত ও ইলমের ইশ্কে। ইলম যত পক্ক হবে, ইবাদাত তত ফলপ্রসু হবে।

আল্লাহর কালামের, প্রজ্ঞা ও সুন্নাহর প্রজ্ঞায় আলোকিত জীবনের অধিকারী হতেই তো আমরা এত কষ্ট স্বীকার করছি। নয় কি? আসুন, দোয়া করি আল্লাহর শাহী দরবারে এই বলে যে- ইয়া হাইয়্যু, ইয়া ক্বাইয়ুম, বিরাহমাতিকান আসতাগিছ। আমীন।

সমাপ্ত